দৈনিক সংবাদ

তাং ... 08 SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

5

নারী ও শিক্ষকতা

এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষকতার পেশায় নারীকেই কেবল যোগ্য মনে করা হতো। হয়তো সন্তান ধারণ, লালন-পালন এবং সেবাপরায়ণ মাতৃমূর্তি সমাজ আরাধ্য রূপটি থেকেই এই ধারণার সূত্রপাত। কেবল তাই নয়, নারীকে গৃহ-অভ্যন্তর থেকে কর্মের চৌহদ্দিতে পদার্পণের অনুমতি দেয়া হয় সেবামূলক কর্মকে কেন্দ্র করেই, বিশেষ করে এই উপমহাদেশে। সেকালে নারীও অনন্যসাধারণ কৃতিত্বে শিক্ষকতার ব্রত পালন করে গেছেন। শিক্ষা বিস্তারে নারীর অবদান অপরিসীম। কিন্তু সেই চিরাচরিত নিয়মেই প্রাথমিক এবং স্কুল পর্বের শিক্ষকতাকেই যতখানি গুরুত্ব দেয়া হতো-উচ্চতর শিক্ষকতায় তাদের একেবারেই নয়। এ ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সংগ্রামের মাধ্যমে নারী তার জায়গা করে নিয়েছে।

সময়ের ক্রমবিবর্তনে জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং চাহিদা অনুযায়ী স্কুলের আনুপাতিক বিস্তার এবং কিন্ডারগার্টেনের ব্যাঙছাতা গজিয়ে ওঠা এবং চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি সাম্প্রতিক শহুরে চিত্রের আরেক দিক। সংখ্যা বেড়েছে যেমন, তেমনই কর্মসংস্থানের এই সুযোগ শিক্ষিত নারী মাত্রেই গ্রহণ করছেন উৎসাহী হয়ে। কিন্তু উৎসাহ অনুপাতে তাদের নিষ্ঠা কতটুকুন? যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান-সরকারী স্তরে তাদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। কিন্ডারগার্টেনে যা তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে কিছু অভিযোগ-অনুযোগ শোনা যায় যে, নারীর কাছ থেকে আশানুরূপ নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ইদানীং বিরল। এমনকি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একই অভিযোগ অনুরণিত হয়। বিষয়টিকে মূল্যায়নের জন্য এ প্রতিবেদনের উপস্থাপন। প্রথমে স্কুল পর্যায় থেকেই হোক এ সংক্রান্ত প্রশ্নের সূত্রপাত।

মমতাজ বেগম ১৯৮৮ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত। এর আগে ১৯৬০ থেকেই ইসমাইলিয়া বয়েজ ও গার্লস স্কুলের সরকারী শিক্ষক হিসেবে তার যোগদান দীর্ঘ স্কুল শিক্ষকতার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি কিছু প্রশ্নের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার কর্মজীবনে প্রবেশের পেছনের চরম নিষ্ঠার স্বাক্ষর রয়েছে। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতায়। দেশ বিভাগের পর পিতার হাত ধরে ময়মনসিংহে আসেন (পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন)। এরপর কামরুন্নেসা উচ্চ বালিকা

বিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।

প্রথামতই সে বয়সে বিয়ে এবং সন্তান ধারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। ১৯৬৯-এ পুনরায়, তার পুত্র এবং কন্যার সঙ্গে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় সগর্বে পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। ১৯৭২-এ স্নাতক। এর পর শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিবেদনের জন্য বি এড পাস করেন।

পারিবারিক পরিসর তার এই পেশার অনুকূলে কাজ করেছিল। বাবা এবং পরে স্বামী এক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। যখন তিনি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন, তখন ও তিনি ছাত্রী। ফলে দিনের বেলায় প্রাইমারী স্কুলের গুরুভার এবং রাতে নৈশকালীন ক্লাসের চরম সঙ্কুল এবং ক্লান্তিকর দায়িত্ব তিনি চালিয়ে গেছেন যুগপৎ। তাঁর এই নিষ্ঠার পেছনে এক অটল আদর্শ কাজ করতো। মানবতার সেবা এবং সৎ ও সুন্দর জীবনের জন্য ত্যাগই একান্ত ব্রত। সুচিন্তার মাধ্যমেই মানুষ কেবল পাহাড় প্রমাণ বাধা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে।

এখনও খুব সাদামাটা বৈধব্য, কনিষ্ঠ পুত্র এবং পুত্রবধূর দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের বুকে জড়িয়ে তিনি পুরনো ঢাকার সাধারণ গৃহে বসবাস করছেন। বাকী তিন সন্তান যার যার ক্ষেত্রে শিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। শোকে-দুঃখে তিনি থেকেছেন অবিচল। স্কুলের কাজ করে গেছেন শত বাধা সত্ত্বেও। তাঁর কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল।

১। শিক্ষকতায় নারীর চাইতে পুরুষ অধিকতর নিষ্ঠাবান-এ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

উত্তরঃ দেখুন, নারী-পুরুষের মধ্যে পেশাগত সীমারেখা টেনে বিচার করা কঠিন-কারণ ব্যক্তি হিসেবে কি নারী কি পুরুষ আপন উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন আপন নিষ্ঠায়। তবুও একটা আনুপাতিক বিচার করতে গেলে দেখা যায়, প্রাইমারী বা প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিশুদের যত্ন যতটা ধৈর্য সহকারে পালন করে, পুরুষ ততটা নয়। উদাহরণে বলব, যেমন শিশুদের টয়লেট ট্রেনিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে শিক্ষিকারা সহনশীলতা দিয়ে বিচার করেন। পুরুষ এক্ষেত্রে কিছুটা অসহিষ্ণু।

অথচ বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে উচ্চতর ক্ষেত্রে। নারী সংসারের টানে স্কুলের সময়সীমার বাইরে বাড়তি সময় ব্যয় করতে অপারগ। বিবাহিত নারী মাত্রেই গৃহের দায়িত্বের তাড়নায় তাকে ঘর ফেরার জন্য উদগ্রীব দেখা যায়। এমনকি স্বামী তার কর্মজীবনের ইতি ঘটাবেন যদি গৃহ অবহেলিত হয়-এই আতংকও তার মধ্যে কাজ করে। কিন্তু পুরুষ শিক্ষক ব্যবহারিক জীবনের দায়দায়িত্ব যত্ন নিয়ে সময় দিয়ে পালন করে। বাড়তি সময় স্কুলে ব্যয় তাদের জন্য কষ্টসাধ্য নয়। তাই স্কুল কমিটিও পুরুষকে উচ্চতর পর্যায়ে অধিক সংখ্যায় নিয়োগকে গুরুত্ব দেন।

প্রশ্ন ২ঃ আপনি নারীর এই অবস্থাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন এবং এর প্রতিকার বা সম্ভাবনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

উত্তরঃ কথাটা একটু মারমুখো শোনালেও আমি বলতে বাধ্য যে, এক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজের একটা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যিনি কর্মজীবী, তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ হবেন, এই গুণটিকে যদি এ সমাজ গুরুত্ব দেয়, তবেই কেবল এর সমাধান সম্ভব। তবে আমি পুরুষকে একতরফা দোষে অভিযুক্ত করবো না. কারণ আমিও নিজের কর্মের প্রতি নিষ্ঠা যে ব্যক্তিত্বের একটি অঙ্গ বলে গৃহে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম, সেভাবেই যদি মেয়েরাও গৃহ এবং প্রতিষ্ঠান, উভয় ক্ষেত্রের কর্মকেই সমান গুরুত্ব দেয় এবং কর্ম মাত্রেই এক ধরনের ধর্ম পালনের মত পবিত্র দায়িত্ব মনে করে-তাহলেই কেবল এক্ষেত্রে একটা নবতর চেতনার বিস্তার ঘটবে। পুরুষ ও নারী সংসার সীমান্তের সৈনিক-দু'জনার বোঝাপড়ায় একটা সুস্থ সমাজ গড়া সম্ভব। স্কুলের শিক্ষা অনাগত আগামীকে গড়ার শিক্ষা, এই পেশায় নিযুক্তি মানেই অন্যের শিশুকে নিজের বলে, ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে গৃহের পুরুষকেও সমমর্মি তা দিয়ে স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রকে বিচার করতে হবে। নারীর ওপর সাংসারিক দায়ভার এককভাবে ন্যস্ত না করে, এর ভাগাভাগিই তাদের কাছ থেকে কাম্য।

মেয়েরা এগিয়ে যাবার, নিষ্ঠাবান হবার প্রেরণা পাবে তখনই, যখন ব্যক্তি পরিসর থেকে সামাজিক পরিসরের উন্নতি সম্পর্কে তার চেতনা আরো শাণিত হবে। মেয়েরা কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই, এক্ষেত্রেও বা কেন তারা অকারণ দুর্নামের ভাগী হবে। আমি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি, সুস্থ জীবনের জন্য আনুষঙ্গিক বা প্রয়োজন-তার অন্যতম হলো মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা।